Vol. 5 | No. 1 | 1961

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ

Volume	5
Issue	1
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	June 15, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i1.5
Pages	65-88
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ

মুহম্মদ আবদুল হাই

Check for updates

॥ এক ॥

বছর পঁচিশেক আগেও পাক-ভারত উপমহাদেশে ভাষাতত্ত্ব বলতে সাধারণতঃ আমরা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বই বুঝতাম। আর বহু ভাষাবিদই সাধারণ্যে ভাষা-তাত্ত্বিক নামে পরিচিত হ'তেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে এ রকম একটা ধারণা ছিল। Comparative Philology বা তুলনামূলক ভাষা আলোচনাই ছিল এ শতাব্দীর ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার য়ুরোপীয় তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পঠনপাঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে; ফলে গ্রীক, ল্যাটিন, প্রাচীন পারশী এবং সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাগুলোর মধ্যে এক আশ্চর্য দৈহিক ও আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে ভিন্ন খাতে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা সুরু হয়। এ শতাব্দীর ভাষা আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইতিহাসভিত্তিক। যে-কোনো একটি ভাষার বিবর্তন এবং তার শব্দাবলীর বিকাশকাহিনী বর্ণনাই এ বিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল।

ভাষা আলোচনার স্বাভাবিক বিবর্তনের পথ ধরে বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপে বর্ণনাত্মক ভাষা (Descriptive Linguistics) বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে য়ুরোপের লণ্ডন, এডিনবারা, লীড্স, প্যারিস, প্রাগ, কোপেন-হেগেন এবং আমেরিকার হারভার্ড, মিসিগান, পেনসিলভ্যানিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা এবং তার দ্রুত উন্নতি ও বিস্তার সাধিত হ'তে দেখি। বর্তমানে য়ুরোপ আমেরিকায় তুলনামূলক এবং ইতিহাস-ভিত্তিক ভাষা আলোচনা যে একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছে তা নয়, তবে তার পূর্ব-প্রভাব আর নেই। সেখানে বিগত চল্লিশ বছর ধ'রে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানেরই দ্রুত উন্নতি সাধিত হ'য়ে চলেছে।

ভাষা সমাজজীবন গঠন ও রচনার প্রধান উপকরণ। সে জন্যে জীবন্ত মানুষের মুখে ভাষার ব্যবহার তার সজীবতারই পরিচয় বহন করে। তুলনামূলক এবং ইতিহাসভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব ভাষার অতীত রূপের আলোচনা করে। ভাষাবিজ্ঞানের এ দ্বিবিধ শাখায় সেজন্যে ভাষার সামগ্রিক রূপের পরিবর্তে প্রধানতঃ ভাষার শব্দাবলীর এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার ধ্বনি পরিবর্তন এবং বিবর্তনের ইতিহাসই আলোচিত হতে দেখি। সেখানে ভাষাবিশেষের ধ্বনিসমষ্টি থেকে সুরু ক'রে শব্দগঠন, বাক্যরীতি এবং সমাজজীবনে তার প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের সামগ্রিক আলোচনা থাকে না। এ জন্যে একালে আটলান্টিকের উভয়পারে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের সমধিক সমাদর দেখতে পাই।

অথচ পাক-ভারত উপমহাদেশেই এ বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল। এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে যাস্ক, পাণিনি ও পতঞ্জলি প্রমুখ ধ্বনিবিদ এ উপমহাদেশে সংস্কৃত ভাষার চুলচেরা বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের এ শাখার সূত্রপাত করেছিলেন। এখনও য়ুরোপ আমেরিকায় পাণিনির ব্যাকরণকে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির চূড়ান্ত আদর্শ ব'লে গণ্য করা হয়। পাণিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্বর্তী আটাক থেকে মাইল দশেক দূরে সিন্ধুনদীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত প্রাচীন সালাতুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর মুখের ভাষার অর্থাৎ সেকালের পুরুষপুর এবং তক্ষশীলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীন কথ্য আর্য ও সংস্কৃত ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর ভাষা-আলোচনার পদ্ধতি এবং পরিভাষা আজও বর্ণনাভিত্তিক ভাষা-আলোচনায় আদর্শ-স্থানীয় হ'য়ে রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে য়ুরোপ ও আমেরিকায় এ শাখার ভাষা-আলোচনা তাঁরই প্রদর্শিত পথ ধরে চরম উন্নতি লাভ করেছে।

।। দুই ।।

ভাষার বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এতে যে-কোনো একটি ভাষার বিশেষ কালের বিশেষ রূপের বর্ণনা করা হয়। ফলে একটি ভাষাভাষী অঞ্চলের একটি ভাষার বিশেষ প্রাদেশিক রূপ তথা উপভাষার আলোচনাই এ শৃঙ্খলার লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। এক উপভাষাভাষী অঞ্চলের যে কোনো একজনের মুখের ভাষাই উক্ত উপভাষা-বর্ণনার জন্যে আদর্শ হিসেবে এতে গৃহীত হয়। এমনি

ভাবে সেই বিশেষ ভাষার যাবতীয় উপভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সাহায্যে উক্ত ভাষার সামগ্রিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। অন্য কথায় বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান 'ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ শাস্ত্র' তথা ব্যাকরণেরই নামান্তর। এ শাস্ত্র ভাষার ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের প্রশ্ন নির্ণয় করে না, মানুষের মুখের ভাষা যেমনটি ব্যবহৃত হয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দ্বারা তারই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে। সে জন্যে ব্যাকরণের মতই এ শাস্ত্রে (১) ধ্বনিতত্ত্ব, (২) রূপতত্ত্ব, (৩) বাক্যরীতি এবং (৪) বাগর্থ (শব্দার্থ বিজ্ঞান), এ চারটি প্রধান ভাগ দেখা যায়। ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের জন্যে এ চারটি প্রধান শাখার প্রত্যেকটিরই আবার বহু প্রশাখা রয়েছে। যেমন ধ্বনিতত্ত্বের (Phonology) মধ্যে (১) ভাষার ধ্বনি-গুলোর উচ্চারণ (Phonetics), (২) তাদের ব্যবহার ও বণ্টন, (৩) সন্ধি ও সঙ্গতি, (৪) ছন্দোবিধি, (৫) লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং (৬) যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি; রূপতত্ত্বের (Morphology) মধ্যে শব্দের গঠন সম্পর্কিত নিয়ম তথা শব্দ ও পদসাধন,—(১) শব্দের নিম্নতম অংশ বা কণিকা নির্ণয় যেমন,—ধাতু, প্রত্যয় (কৃৎ ও তদ্ধিত), উপসর্গ, অনুসর্গ, বিভক্তি ইত্যাদি (২) সমাস, (৩) সুঙ্-তিঙ্ তথা অব্যয় বা নিপাত ইত্যাদি; বাক্যরীতির (Syntax) মধ্যে শব্দ ও পদের ক্রম এবং বাক্য বিশ্লেষণের ধারা; এবং শব্দার্থ বিজ্ঞান (Semantics) বা বাগর্থের মধ্যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ নির্ধারণ এবং তার প্রক্রিয়া নির্ণয়।

যে কোনো ভাষার বর্ণনাত্মক আলোচনায় মোটামুটি এ বিধিগুলোই প্রয়োগ করা হয়। যে কোনো একটি ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে সে ভাষাটি আশ্চর্যভাবে স্বতন্ত্র। অন্যান্য ভাষার ধ্বনি বা ব্যবহার বিধির সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে তার আপাত মিল দেখা গেলেও, এমন কি ভাষাবিশেষের বিবর্তনের পথে তার অব্যবহিত পূর্বরূপের সঙ্গে অব্যবহিত পরের উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় প্রতিটি ভাষাই বিস্ময়করভাবে তার পার্থক্য বজায় রেখেছে। ভাষাবিশেষের এ যাবতীয় স্বাতন্ত্র্যের—অন্য কথায় তার মূলধ্বনি থেকে সুরু ক'রে সে ভাষা একটি বিশেষ সমাজজীবনে কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলে তার এক একটি শব্দের কত বিচিত্র ব্যবহার এবং রং, রূপ, রেখার সমন্বয়ে তার রহস্যময় প্রয়োগের বিস্ময়করতা উদ্ধারই ভাষাবিজ্ঞানের এ শাখার অন্যতম লক্ষ্য।

॥ তিন ॥

পাণিনি, পতঞ্জলি প্রমুখ ধ্বনিবৈজ্ঞানিক এ উপমহাদেশে ভাষাতত্ত্বের বর্ণনামূলক শাখার আলোচনার প্রবর্তন এবং তার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ শুধু এ ধারার অনুবর্তন নয়, ভাষা-আলোচনা তথা ভাষা বিজ্ঞানের সাধনা কালক্রমে এ দেশ থেকে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায়। ফলে বিগত দেড়-হাজার বছরে এ উপমহাদেশে ভাষার কোন রকম আলোচনাই হ'তে দেখি না।

বিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপ আমেরিকায় বিগত তিরিশ বছরে ভাষার বিজ্ঞান-ভিত্তিক বর্ণনামূলক আলোচনা যেখানে দ্রুত প্রসার এবং বিস্তৃতি লাভ করে, এ উপমহাদেশে সেখানে বিগত এবং বর্তমান শতাব্দীতে জন কয়েক মনীষী প্রধানত ভাষার ইতিহাসভিত্তিক আলোচনাতেই নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। বীম্‌সের 'Comparative Grammar of Modern Aryan Languages,' রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের 'Wilson Philological Lectures,' হর্ণলির 'Comparative Grammar of the Gaudian Language' এবং স্যার জর্জ গ্রীয়ারসনের 'Linguistic Survey of India' এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ট্রাম্পের Sindhi Grammar' এবং কেলগের 'Hindi Dialects' ছাড়া বিগত শতাব্দীতে স্বতন্ত্র ভাষার বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না।

বাংলা দেশে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ডক্টর সুকুমার সেনই এ বিষয়ে অগ্রণী। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'The History of the Bengali Language' (১ম সংস্করণ, ১৯২০), ১৯২৬ সালে প্রকাশিত সুনীতিবাবুর 'Origin and Development of the Bengali Language' (vols I & 11), শহীদুল্লাহ সাহেবের দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ভাষাতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (শীত সংখ্যা ১৩৬৫, ইং ১৯৫৮) মুদ্রিত 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' এবং সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১ম সং ১৯৩৯) এক্ষেত্রে আমাদের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। গ্রীয়ারসনের Linguistic Survey of Indiaয় এ-উপমহাদেশের ৮০০টি ভাষা এবং উপভাষার আলোচনার পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ১৭৯টি ভাষা এবং ৫৪৪টি উপভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে ধরিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমান যুগে ভাষা বিজ্ঞানের

বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে ব'লে Linguistic Survey of Indiaর নানা ত্রুটিবিচ্যুতি চোখে পড়ে এবং তাঁর আলোচনা ও উপকরণ সংগ্রহের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নানা খুঁটিনাটি প্রশ্নের সমাধানে আমাদের কোনো সহায়তা করে না, তবু এ-উপমহাদেশের ভাষার জরিপঘটিত গ্রীয়ারসনের এ অমূল্য গ্রন্থাবলী ভবিষ্যৎ কালের ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছেও নানাভাবে আদর্শস্থানীয় হ'য়ে থাকবে।

ওপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, বাংলা ভাষার ইতিহাসভিত্তিক যে আলোচনা আমরা পাই তার মূল্য নিতান্ত কম নয়। এর তুলনায় বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে আমাদের ভাষাতাত্ত্বিকদের দান নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয়না। গ্রীয়ারসনের Linguistic Survey of India vol V-এ বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা সংক্রান্ত আলোচনা, ১৩০৮ (১৯০১) সাল থেকে ১৩১৩ (১৯০৭) সালের মধ্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত এবং 'শব্দকথা' (১৩২৪ সাল, ১৭১৭ খৃঃ) প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিৎ', 'না', 'কারক প্রকরণ' এবং 'ধ্বনি বিচার' প্রভৃতি প্রবন্ধ, সুনীতিবাবুর 'Bengali Phonetic Reader (১৯২৮) এবং Sutton Pageএর Colloquial Bengali' বাংলা ভাষা সংক্রান্ত বর্ণনাত্মক আলোচনার একরকম দিগদর্শন।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে যাঁকে আমরা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং বাংলা ভাষার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি বলে জানি, সেই কবি রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার বর্ণনাভিত্তিক আলোচনার জনক এবং পথিকৃৎ হ'য়ে রয়েছেন। ভাষাবিজ্ঞানের এ শাখার আলোচনা বিজ্ঞান সাধনারই নামান্তর; অথচ কবিরা সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক হন না। তাই এ পথে রবীন্দ্রনাথকে নামতে দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হ'য়ে উঠি। তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' (গদ্য গ্রন্থাবলীর পঞ্চদশ ভাগরূপে ১৩১৫ (১৯০৯) সালে প্রকাশিত) এবং 'বাংলা ভাষা পরিচয়' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৩৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত) নামক গ্রন্থ দু'টি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শুধু নয়, অবিস্মরণীয়।

'শব্দতত্ত্ব' ইংরেজী ১৯০৯ সনে গ্রন্থ হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হলেও তার বহু আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলী লিখতে শুরু করেন। 'বালক'-এ ১২৯২ (১৮৮৫ খৃঃ) সালের আশ্বিন মাসে তাঁর এ-সম্পর্কিত প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলা উচ্চারণ' প্রকাশিত হয়। ১২৯৯ (১৮৯২ খৃঃ) সালের আষাঢ়, কার্তিক

এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সাধনা'য় যথাক্রমে প্রকাশিত হয় 'স্বরবর্ণ অ' 'স্বরবর্ণ এ' এবং 'টা, টো, টে'। তারপর ১৩০৫ (১৮৯৮) থেকে ১৩১১ (১৯০৪ খৃঃ) সালের মধ্যে তিনি বালক, সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন এবং সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বাংলার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব তথা বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক বহু জটিল প্রশ্নের আলোচনা ক'রেন।

সেকালেও যে বাংলা ভাষার 'বিশুদ্ধ বাংলা ব্যাকরণ' লিখিত হয়েছে, তা বলা যায় না। বাজারে প্রচলিত একালের অধিকাংশ বাংলা ব্যাকরণই সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালা এবং সংস্কৃত ভাষাবিশ্লেষণের সূত্রাদিতে ভরা। অথচ কোন্ ভাষাবিদ না জানেন যে সংস্কৃত থেকে বিবর্তনের পথে বাংলা উদ্ভূত হ'লেও সংস্কৃত থেকে বাংলা সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির ভাষা। অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষা যেমন ঋণ গ্রহণ করেছে, সংস্কৃত থেকেও তেমনি কিংবা পরিমাণে কিছু বেশী শব্দ সে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এক কালে ইংরেজী ব্যাকরণ যেমন ল্যাটিন ভাষার ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালাই করা হোতো, বাংলা গদ্য প্রথমত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে গ'ড়ে ওঠার জন্যে এবং সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সগোত্রতার জন্যে তেমনি বাঙালী পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষার সূত্রাদির ভিত্তিতে তার প্রকৃতি বিচার করতেন। এমনকি দেশজ, দ্বিত্ববোধক ও ধ্বন্যাত্মক প্রভৃতি বাংলা ভাষার অবিমিশ্র শব্দাবলীর ব্যবহার বাংলায় অপাংক্তেয় বলে ভাষার শাস্ত্র তথা ব্যাকরণে তাদের উল্লেখও দূষণীয় মনে করতেন।

এ জন্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে কেন্দ্র করে ১৩০৮ (১৯০১ খৃঃ) সালে বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত একটি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (১১ই শ্রাবণ, ১৩০৮) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুগত বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নের আবশ্যকতা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করেন।' শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রবন্ধ উপলক্ষ করে সেই অধিবেশনে যে 'বিচার বিতর্ক' উপস্থিত হয় তাতে অংশ গ্রহণ করেন বীরেশ্বর পাঁড়ে, চারুচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'বাংলা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য' সেদিন সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে বলেছিলেন ঃ—

> 'আমাদের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যাঁহারা গড়িতে যাইবে তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে তাঁহারা ভাষায় যাহা আছে তাহারই প্রয়োগ প্রকৃতি, গঠন প্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র ; কেহ কিছু গড়িবেন না।'

...শিক্ষার বিস্তারের জন্য রচনার ভাষা যত কথিত ভাষার নিকটবর্তী হইবে ততই সুফল ফলিবে। ভাষা অর্থে যদ্বারা ভাষণ করা যায়, সুতরাং তাহা কথিত ভাষার নিকটবর্তী হওয়াই উচিত।'

বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত এ আন্দোলন ও বাদানুবাদে এবং শব্দতত্ত্বের প্রবন্ধাবলী লেখার পেছনে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল তা তাঁর কথার উদ্ধৃতি দিয়েই ভালো বোঝানো যায়ঃ—*

'বাংলা ভাষা বাংলা ব্যকরণের নিয়মে চলে এবং সে ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে।'

(শব্দতত্ত্ব, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৫৭৮)

...'যে কথাগুলি লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে বাংলায় রাখা বা বাংলা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া আমার বা আর কাহারও সাধ্যই নহে। তাহারা আছে এবং কাহারও কথায় তাহারা নিজের স্থান ছাড়িবে না। জগতে যে কোনো জিনিষই আছে, তাহা ছোটো হউক আর বড়ো হউক, কুৎসিত হউক, আর সুশ্রী হউক, প্রাদেশিক হউক আর নাগরিক হউক, তাহার তত্ত্বনির্ণয় বিজ্ঞানের কাজ। শরীরতত্ত্ব কেবল উত্তমাঙ্গেরই বিচার করে এমন নহে, পদাঙ্গুলিকেও অবজ্ঞা করেনা। বিজ্ঞানের ঘৃণা নাই, পক্ষপাত নাই।' (ঐ, পৃ ৫৬৫)

'ভাষায় যাহা আছে আমি তাহাই ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।' (ঐ, ৬৩৭)

'বৈয়াকরণের যে সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই। শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু; কিন্তু বাংলাভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি। এই জন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি ক্লান্তিবোধ করি না। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভাণ্ডার হইতে যাহা কিছু আহরণ করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে তাহার এটা, ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি; ইহাতে ব্যাকরণকে চিরঋণে বদ্ধ করিতেছি বলিয়া স্পর্ধা করিব না, ভুলচুক অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট থাকিবে। কিন্তু আমার এই চেষ্টায় কাহারও মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলা ভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকার প্রকার আছে এবং আকৃতি প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা সার্থক হইবে।' (ঐ, পৃ ৪০৯-১০)

---

* রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ ৬৩১—৩২

এ-কালে য়ুরোপ আমেরিকায় বর্ণনাভিত্তিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ভাষার যে চুলচেরা বিশ্লেষণ হচ্ছে কিংবা এ উপমহাদেশে পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণ সেকালের সংস্কৃত ভাষার যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার তেমন আলোচনা করেন নি। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি এবং বাগর্থ ইত্যাদি প্রকরণের সাহায্যে একটি ভাষার যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় এবং এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যাদির গবেষণাগারে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' এবং 'বাংলা ভাষা পরিচয়ে' বাংলা ভাষার তেমন খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণও করেন নি। কারণ সে শিক্ষা তাঁর ছিল না এবং প্রয়োজনও ছিল না। সাহিত্যিক প্রয়োজনে বাংলা ভাষা নিয়ে সাধনা করতে গিয়ে প্রখর মনীষা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এ ভাষার যে নিগূঢ় পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন এবং প্রতিদিনের ব্যবহারে এ ভাষার রূপ তাঁর কাছে যেভাবে খুলে গিয়েছিল তিনি তারই সহজ ও স্বাভাবিক বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর এ গ্রন্থ দুটিতে। তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' তবু নিছক কবির লেখা নয়, তা বিজ্ঞানীর সাধনার তত্ত্ব ও তথ্যনির্ভর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এবং সে আলোচনা বর্ণনাত্মক এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাসভিত্তিক ভাষাবিজ্ঞানের পথ ধরেই অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি, তার শব্দগঠন, বাগ্‌বিধি, অর্থবিচার এবং প্রয়োগ মাধুর্যের আবিষ্করণের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

॥ চার ॥

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ধ্বনি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, প্রথমে তারই বিচার করা যাক। যে কোনো ভাষার বাক্‌ধ্বনি স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সমষ্টি। সুতরাং ভাষাবিশেষের প্রতিটি স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিরই একটি উচ্চারণ স্থান ও প্রক্রিয়া রয়েছে। কিন্তু বাক প্রবাহে শব্দ ও বাক্যের মধ্যে যে কোনো একটি বিশেষ ধ্বনির কিছু না কিছু স্বধর্মচ্যুতি ঘটে। এ কথা স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় জাতীয় ধ্বনি সম্পর্কেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। ধ্বনি বৈজ্ঞানিক এ কথার যাথার্থ্য যতটা উপলব্ধি করেন, অন্যের কাছে এর গুরুত্ব ততটা পরিস্ফুট হয় না। তবু ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির পরিবর্তনটা সাধারণ লোকেরও চোখে পড়ে। বাংলা ধ্বনি সংক্রান্ত আলোচনায় এ কারণেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ব্যঞ্জনধ্বনির তেমন আলোচনা না ক'রে স্বরধ্বনির মধ্যেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

ইংরেজীর মতো বানান ও লিখন পদ্ধতিতে এমন অসঙ্গতি অন্য কোনো ভাষাতে বোধহয় আর নেই। 'ইংরেজ লেখে এক রূপ, পড়ে অন্যরূপ।' বাংলা বানান এবং লিখনপদ্ধতি সেদিক থেকে অনেক উন্নত। কিন্তু তা ব'লে বাংলাও যে ত্রুটিমুক্ত এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলাতেও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে বানানের সহিত উচ্চারণের পার্থক্য আছে, তাহা সহসা আমাদের মনে উদয় হয় না।' এ পার্থক্য যেমন স্বরধ্বনির জন্যে তেমনি স্বরধ্বনিতেই বিশেষভাবে মূর্ত হ'তে দেখি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' এবং 'ভাষা পরিচয়' গ্রন্থ দুটিতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।*

রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বাংলা উচ্চারণে ইকার এবং উকার খুব কর্মিষ্ঠ, একার এবং ওকার ওদের শরণাগত, বাংলা অকার এবং আকার উৎপাত সইতেই আছে।' আমরা লিখি অতি, মতি, গতি, সরু, জরু, গরু, কলু ইত্যাদি কিন্তু পড়ি ওতি মোতি, গোতি, সোরু, জোরু, গোরু, কোলু। আমরা লিখি বক্ষ, রক্ষা, সত্য, গন্ধ, মন, বন, ধন ইত্যাদি কিন্তু পড়ি বোক্ষ, রোক্ষ, সোত্তো, গোদ্দো, মোন, বোন, ধোন। আমরা লিখি খেলা, দেখা, বেচা ইত্যাদি কিন্তু পড়ি খ্যালা, দ্যাখা, ব্যাচা। আবার সুবিধা ও শ্রুতি মাধুর্যের দিক থেকে আমাদের হিসাব হয় হিসেব, মাহিনা—মাইনে, ভিক্ষা—ভিক্ষে, নিন্দা—নিন্দে, চিঁড়া—চিঁড়ে, বিলাত—বিলেত, কৈলাস—কৈলেস, অভ্যাস—অভ্যেস, কন্যা—কন্যে, হত্যা—হত্যে, ফুটা—ফুটো, মুঠা—মুঠো, কুলা—কুলো, চুমা—চুমো, নৌকা—নৌকো, কৌটা—কৌটো ইত্যাদি। আবার শব্দের শেষে টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি প্রভৃতি যুক্ত হ'লে তার পূর্ব স্বরেও নানা রকম পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন 'টা'র পূর্বে এক—একই থাকে, তার উচ্চারণ পাই এ্যাকটা। কিন্তু টির পূর্বে হয় একটি। তেমন দুইটা হয় দুটো, তারপর দুটি। বানান এবং উচ্চারণের এ অসঙ্গতি লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'যদি কোনো বাংলা ব্যাকরণে এই সাধারণ নিয়ম লিখিত থাকিত যে, ইকার, উকার, ক্ষ, এবং ণ ও ন-র পূর্বে প্রায় সর্বত্রই অকারের উচ্চারণ ওকারবৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ-প্রচলিত উচ্চারণের আদর্শ তাঁহাদের পক্ষে সুগম হইতে পারিত।'

("বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ", শব্দতত্ত্ব, রচনাবলী, ১২ খণ্ড পৃঃ ৩৫২)

---

* দ্রষ্টব্য শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড পৃ ৩৩৪-৩৫৭ ; ভাষা-পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড পৃ ৪০৮-৪২০

রবীন্দ্রনাথ বাংলা স্বরধ্বনির কোথায় কোন্ পরিবর্তন হয় আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে তার উল্লেখ করেছেন কিন্তু ইকার এবং উকারের পূর্বে অ কেন ও-তে পরিণত হয়, আ-র পূর্বে ই কেন এ এবং কেন এ্যা হ'য়ে যায় এ-সবের কারণ তিনি নির্ধারণ করবার প্রয়াস পান নি। এগুলো এ-কালের বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান মতে চলিত বাংলায় স্বরসন্ধি তথা স্বরসঙ্গতির উদাহরণ। ই এবং উ যথাক্রমে সম্মুখ ও পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি আর অ পশ্চাৎ অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি। তাদের পাশাপাশি উচ্চারণে জিহ্বার দ্রুত অবস্থান্তর কিছুটা অসুবিধাজনক ব'লে সংবৃত স্বরধ্বনি ই বা উ তার পূর্ববর্তী অর্ধবিবৃত অ-কে তবু কিছু কাছাকাছি টেনে নিয়ে পশ্চাৎ অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি ও-তে পরিণত করে। অ-র পর ই বা উ যে উচ্চারণ করা যায় না তা নয়। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই; তবু মানুষ স্বভাবত আরামপ্রিয় ব'লে ভাষার উচ্চারণ ব্যাপারেও সে একটা সহজ স্বাভাবিকতার পথ খুঁজে ফেরে। সেজন্যে একই শব্দের পাশাপাশি স্বরধ্বনিগুলো তাদের গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়ে একরকম কিংবা প্রায় একরকম কাছাকাছি হ'য়ে উচ্চারিত হ'তে চায়। এজন্যেই আমরা গরু থেকে গোরু, অতি থেকে ওতি, গতি থেকে গোতি, বিলাতি থেকে বিলেতি এবং তারপরে বিলিতি, দেশী থেকে দিশি, উড়ানি থেকে উড়ুনি, নিড়ানি থেকে নিড়ুনি, এখনি থেকে এখুনি, চিরণি থেকে চিরুণি, উনান থেকে উনুন, কুড়াল থেকে কুড়োল তা থেকে কুড়ুল, জুতা থেকে জুতো, পূজা থেকে পূজো, গুঁতা থেকে গুঁতো, কুমার থেকে কুমোর, পুতল থেকে পুতুল ইত্যাদি উচ্চারণ পাই। চুমা এ কারণে হলো চুমো, আর অতি আবেগে চুমু। এ নিয়ম ধ'রে কিছু দিনের মধ্যে জুতো যদি 'জুতু' আর পূজো 'পুজু' হ'য়ে যায় তাতে বিস্মিত হবো না। কোনো কোনো ভাষায় স্বতন্ত্র ধ্বনি হিসেবে দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊর অস্তিত্ব আছে। ভাষার একটি ধ্বনি একটি স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দ গঠন করতে পারে কিনা উক্ত ভাষার স্বতন্ত্র ধ্বনির অস্তিত্ব বিচারে সেটিই সবচেয়ে বড় মাপকাঠি। আমাদের পরিচিত ইংরেজী ভাষা থেকেই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন ইংরেজী fill এবং feel, sit এবং seat, কিংবা full এবং fool ইত্যাদি শব্দ। এ উদাহরণগুলো থেকে ইংরেজী ভাষার স্বতন্ত্র অর্থবোধক হ্রস্বং এবং দীর্ঘ i :, হ্রস্ব u এবং দীর্ঘ u : র অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বাংলা বর্ণমালায় হ্রস্ব ই এবং দীর্ঘ ঈ, হ্রস্ব উ এবং দীর্ঘ ঊ থাকলেও স্বতন্ত্র শব্দগঠনে সহায়ক মূলধ্বনি বা phoneme হিসেবে বাংলায় হ্রস্ব বা দীর্ঘ 'ই' বা 'উ'র কোনো অস্তিত্ব নেই। বাংলায় আছে শুধু 'ই' বা 'উ'। গবেষণাগারে পরীক্ষা

ক'রেই আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি। তবে স্থানবিশেষে ই এবং উ কোথাও হ্রস্ব এবং কোথাও দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়। কোথায় হ্রস্ব এবং কোথায় দীর্ঘ হয় তার বিচার স্বতন্ত্রভাবে আলোচনাসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ঃ—

> সাধারণত বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। তবু কোনো কোনো স্থলে স্বরের উচ্চারণ কিছু পরিমাণে দীর্ঘ হ'য়ে থাকে। হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের দিকে কান দিলে সেটা ধরা পড়ে, যেমন 'জল'। এখানে 'জ'এ যে অকার আছে তার দীর্ঘতা প্রমাণ হয় 'জলা' শব্দের 'জ' এর সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখলে। 'হাত' আর 'হাতা' প্রথমটির হা দীর্ঘ, দ্বিতীয়টির হ্রস্ব। 'পিঠ' আর 'পিঠে' 'ভুত' আর 'ভূতো', 'ঘোল' আর ঘোলা'—তুলনা ক'রে দেখলে কথাটা স্পষ্ট হবে। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সর্বত্রই, বাংলায় স্থানবিশেষে। কথায় ঝোঁক দেবার সময় বাংলা স্বরের উচ্চারণ সব জায়গাতেই দীর্ঘ হয়, যেমন ঃ ভা—রি তো পণ্ডিত কে—বা কার খোঁজ রাখে, আ—জই যাবো, হল—ই বা, অবা—ক করলে, হাজা—রো লোক, কী—যে বকো, এক ধা—র থেকে লাগা—ও মার। যুক্তবর্ণের পূর্বে সংস্কৃতে স্বর দীর্ঘ হয়, বাংলায় তা হয় না।
>
> (বাংলাভাষা পরিচয়, রচনাবলী, ২৬ খণ্ড পৃ ৪১৬)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' এবং 'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এ বাংলা ভাষার রূপতত্ত্ব (morphology) ঘটিত কোনো ব্যাকরণবিদ কিংবা আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকের মতো এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন নি। ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় কয়েকটি উচ্চারণ ঘটিত সমস্যার ওপরে যেমন তিনি আলোকপাত করেছেন, এ ভাষার রূপতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়েও তেমনি অল্প কয়েকটি বিষয় নির্বাচণ করে নিয়েছেন। বাংলা 'বহুবচন', 'সম্বন্ধে কার', 'কৃৎতদ্ধিৎ' এবং 'উপসর্গ সমালোচনা' এবং 'কর্ম ও সম্প্রদান কারক'ই তাঁর বিচার্য বিষয়গুলোর মধ্যে মুখ্য।

বাংলা বহুবচন (রচনাবলী, ১২ খণ্ড, পৃ ৩৫৮) এবং 'উপসর্গ সমালোচনা' (ঐ, পৃ ৫৫১) প্রবন্ধ দুটি যতটা ইতিহাসভিত্তিক ততটা বর্ণনামূলক আলোচনা নয়। প্রথমটিতে তিনি বাংলা বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি 'রা' 'গুলা' 'গুলি'র ব্যুৎপত্তি এবং বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিকের মতো তিনিও যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন তা উল্লেখযোগ্য ঃ

রা বিভক্তি বহুবচন বাচক বটে কিন্তু উহা মূলে সম্বন্ধবাচক। 'পাখিরা সব' অর্থ পাখি সম্বন্ধীয় সমষ্টি।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কর্তৃকারক এবং সম্বন্ধে বহুবচনে বাংলা প্রায় সমুদয় গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কেবল রাজপুতানি নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মনোযোগ পূর্বক অনুধাবন করিলে অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত বাংলার এই সকল বহুবচন রূপের যোগ পাওয়া যায়, এই প্রবন্ধে তাহারই অনুশীলন করা গেল।

'উপসর্গ সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩০৬ (১৮৯৯) সালে। এখানে তিনি লিখেছেন ঃ

এইরূপ আর্য ভাষার নানা শাখার আলোচনা করিয়া উপসর্গের মূলে উপনীত হইতে যে পাণ্ডিত্য অবকাশ এবং প্রামাণিক গ্রন্থাদির সহায়তা আবশ্যক, আমার তাহা কিছুই নাই। যাঁহাদের সেই ক্ষমতা ও সুযোগ আছে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই সম্ভবে না। স্বল্প প্রমাণ ও বহুল অনুমান আশ্রয় করিয়া কয়েকটি কথা বালব, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও তদ্বারা যোগ্যতর লোকের মনে উদ্যম সঞ্চার করিয়া দিতে পারে, এই আশা করিয়া লিখিতে স্পর্ধিত হইতেছি।

ভাষাতাত্ত্বিক না হওয়ার স্বাভাবিক কুণ্ঠা এ কথাগুলোতে প্রকাশ পেলেও রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার উপসর্গাদির সঙ্গে তুলনা ক'রে বাংলা সংস্কৃতের কয়েকটি উপসর্গের যে বিবর্তন দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর ভাবেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

শব্দতত্ত্বের 'সম্বন্ধে কার' শীর্ষক প্রবন্ধটি কিছুটা ইতিহাসভিত্তিক আর কিছুটা বর্ণনামূলক ও বাগর্থবোধক। 'সংস্কৃত 'কৃত' এবং তাহার প্রাকৃত অপভ্রংশ 'কের' শব্দ হইতে বাংলা ভাষায় সম্বন্ধে 'র' বিভক্তির সৃষ্টি হইয়াছে।' কিন্তু বাংলা ভাষায় 'কৃত শব্দের অপভ্রংশ কার কেনই বা কোনো কোনো স্থলে অবিকৃত রহিয়াছে এবং কেনই বা অন্যত্র কেবলমাত্র তাহার র অক্ষর অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভাষা ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট জীবের মতো কেন যে কী করে, তাহার সম্পূর্ণ কিনারা করা যায় না।'

এ ব'লে কোথায় কোথায় বাংলায় সম্বন্ধে 'কার' বিভক্তির ব্যবহার হয় তিনি তার একটি তালিকা দিয়েছেন, যেমন, এখনকার, তখনকার, এ-বেলাকার,

ও-বেলাকার, এ দিককার, ওদিককার, সেদিককার, আজকেকার, কালকেকার, পরশুকার, ভিতরকার, বাহিরকার ইত্যাদি।

এ থেকে সময় ও অবস্থান (Position) সূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গেই যে কার বিভক্তির ব্যবহার হয়, তিনি তা-ই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এর গুটি কতক ব্যতিক্রমের কথাও যে তিনি বলেন নি তা নয়—যেমন মনুষ্য সংখ্যাবাচক একজনকার, দুইজনকার ইত্যাদি। এরই সঙ্গে সকলকার এবং সত্যকারও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সকলকার হয় কিন্তু সমস্তকার হয় না (প্রাচীন বাংলায় সভাকার), সত্যকার হয় কিন্তু মিথ্যাকার হয় না।'

'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিৎ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রাকৃত বাংলায় কৃৎ তদ্ধিৎ প্রত্যয় কি ভাবে ব্যবহৃত হয় তিনি তার সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিৎ বাংলা কৃৎ-তদ্ধিৎ থেকে গঠনে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ পৃথক, আমাদের ব্যাকরণবিদেরা এ কথা অনেক সময় ভুলে যান দেখেই যত গোলোযোগের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ এ কথাটার ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নিছক বাংলা কৃৎ তদ্ধিৎ সম্পর্কেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁর আলোচ্য বাংলা প্রত্যয় যথাক্রমে এগুলো :—

অ :—'আসন্ন প্রবণতা বুঝাইবার জন্য শব্দদ্বৈত যোগে যে বিশেষণ হয় তাহাতে এই অ প্রত্যয়ের হাত আছে, যথা, পড়্, ধাতু হইতে পড়-পড়, পাক্ ধাতু হইতে পাক-পাক, কাঁদ্ ধাতু হইতে কাঁদ-কাঁদ' ইত্যাদি।

আ : 'বাংলায় অনেক শব্দ আছে, যাহা কখনো বা স্বার্থে আ প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনো করে নাই, যেমন বাঘ বাঘা, থাল থালা, ল্যাজ ল্যাজা, চোঙ চোঙা, পাত পাতা, ভাই ভাইয়া (ভায়া), বাদল বাদলা, ইলিশ ইলশা' ইত্যাদি।

'এই আ প্রত্যয়যোগে অনেক স্থলে অবজ্ঞা বা অতি পরিচয় জ্ঞাপন করে, বিশেষত মানুষের নাম সম্বন্ধে, যথা রাম রামা, শাম শামা, হরি হরিয়া (হরে) ইত্যাদি।'

'আন্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত : যোগান্, চাপান্, চালান্, জানান্, হেলান্, ঠেসান্, মানান্ ইত্যাদি।'

আন্+অ প্রত্যয় :—যেমন, চুল্কান, (উচ্চারণে চুলকানো)। কামড়ান্ (উচ্চারণে কামড়ানো) হাত থেকে হাতানো, পিট থেকে পিটান (পিটোনো) ইত্যাদি।

অন্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত : চলন্, কাঁদন, গড়ন্, মাজন্, ফোড়ন্, ঝোঁটন্ পাঁচন্ ইত্যাদি।

অন+আ প্রত্যয়ঃ যেমন পাওন থেকে পাওনা, দেওন থেকে দেনা। মাগন্ থেকে মাগনা, ফেলন থেকে ফেল্না, তেমন বাটনা, কুটনা ইত্যাদি।

ই প্রত্যয়ঃ ধর্ম ও ব্যবসায় অর্থে—যেমন চালাকি, চাকুরি, চুরি, ডাক্তারি,
অনুকরণ অর্থে — সাহেবি, নবাবি।
দক্ষ অর্থে — হিসাবি, আলাপি।
বিশিষ্ট অর্থে — দামি, দাগি, রাগি, ভারি।
ক্ষুদ্র অর্থে — হাঁড়ি, পুঁটুলি, কাঠি (ইহাদের বৃহৎ—হাঁড়া, পোঁটলা, কাঠ)।
দেশীয় অর্থে —মারাঠি, গুজরাটি, আসামি, পাট্‌নাই, বসরাই ইত্যাদি।
স্বার্থে — হাস, হাসি, ফাঁস ফাঁসি।
দিন নির্দেশ অর্থে — পাঁচই, ছয়ই, সাতই, ইত্যাদি।

আ+ই প্রত্যয়ঃ ক্রিয়াবাচক বাছাই, যাচাই, দলাই-মলাই, খোদাই, ঢালাই, ধোলাই ইত্যাদি।
পদার্থ বাচক — মরাই (ধানের), বালাই (বালকের অকল্যাণ), মিঠাই।
মানুষের নাম — বলাই, কানাই, নিতাই, জগাই, মাধাই ইত্যাদি।
ধর্ম — বড়াই, ধামনাই, পোষ্টাই ইত্যাদি।
ই+আ প্রত্যয়ঃ জাল শব্দ ই প্রত্যয় যোগে জালি, স্বার্থে আ—জালিয়া (জেলে) কোঁদলিয়া (কুঁদুলে), জঙ্গলিয়া (জঙ্গুলে), গোবরিয়া (গুবরে) স্যাঁতস্যাতিয়া (স্যাঁতসেতে) ইত্যাদি।

উ প্রত্যয়ঃ চালু, ঢালু, নিচু, কলু, গাড়ু ইত্যাদি।
উ+আ প্রত্যয়ঃ বিশিষ্ট অর্থে জলাবিশিষ্ট জলুয়া (জোলো), পাঁকুয়া (পেঁকো), বাতুয়া (বেতো), পড়ুয়া (পোড়ো)
সম্বন্ধ অর্থে — মাছুয়া (মেছো), বুনুয়া (বুনো), ঘরুয়া (ঘোরো), মাঠুয়া (মেঠো)।
নির্মিত অর্থে — কাঠুয়া (কেঠো), ধানুয়া (ধেনো), ইত্যাদি
আ+ও প্রত্যয়ঃ ঘেরাও, চড়াও, উধাও, ফেলাও ইত্যাদি।
ও+আ প্রত্যয়ঃ বাঁচোয়া, ঘরোয়া, চড়োয়া, ধরোয়া, আগোয়া ইত্যাদি।
অন্+ই প্রত্যয়ঃ যেমন মাতনি, (মাতুনি), কাঁপনি (কাঁপুনি), দাপানি (দাপুনি), আঁটনি (আঁটুনি) ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন অন+ই

প্রত্যয়সিদ্ধ অধিকাংশ ক্রিয়াবাচক শব্দই অপ্রিয়ভাব ব্যক্ত করে; যেমন বকুনি, ধমকানি, হাঁপানি, শাসানি, টাটানি, গোঙানি, নাকানি, চোবানি ইত্যাদি।

অসুখব্যঞ্জক ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য; যেমন টন্‌টনানি, ছট্‌ফটানি, ঝন্‌ঝনানি, কন্‌কনানি ইত্যাদি।

না: পাখনা, জাবনা, ছোটনা ইত্যাদি।

আনা: সাহেবিয়ানা, মুন্সিয়ানা ইত্যাদি।

ল্: হাবল, খাবল, পাগল, পাকল, হাতল, মাতল ইত্যাদি।

র্: ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে অবিরামতা বোধক, যেমন বকর্ বকর্. গজর গজর, নড়রবড়র, ঘ্যানর্ ঘ্যানর্, কুটুর কুটুর ইত্যাদি।

আল্: দয়াল্, কাঙাল্, আড়াল্, মিশাল্ ইত্যাদি।

ল্+আ: মহলা, বাদলা, পাতলা, শামলা, দোকলা, একলা ইত্যাদি।

ল্+ই+আ: দীঘলিয়া (দীঘ্‌লে), আগলিয়া (আগ্‌লে), পাহলিয়া (পাহলে) ইত্যাদি।

আড়্: জোগাড়্, লাগাড়্ (নাগাড়), সাবাড় ইত্যাদি।

আড়্+ই+আ: বাসাড়িয়া (বাসাড়ে), জোগাড়িয়া (জোগোড়ে) মজাড়িয়া (মজাড়ে), হাতাড়িয়া (হাতুড়ে), কাঠুরে, হাটুরে ইত্যাদি।

রা ও ড়া: টুকরা, চাপড়া, ঝাঁকড়া, পেটরা, চামড়া ইত্যাদি।

বহু অর্থে — রাজরাজড়া, গাছগাছড়া ইত্যাদি।

আরি: জুয়ারি, কাঁসারি, ভিখারি ইত্যাদি।

আরু: সজারু, লাফারু, দাবাড়ু ইত্যাদি।

ক্: মড়ক্, মোড়ক্, চড়ক, চমক্, ইত্যাদি।

আক্, উক, ইক: তড়াক্, কুড়ুক, চিড়িক্ ঝিলিক্ ইত্যাদি।

ক+আ: মট্‌কা, বোচকা, হোঁৎকা ইত্যাদি।

ক+ই+আ: শুট্‌কিয়া (শুট্‌কে), পুঁটকিয়া (পুঁটকে) ছুটকিয়া (ছুটকে) ইত্যাদি।

উক্: মিথ্যুক, লাজুক।

গির+ই: মুটেগিরি, বাবুগিরি, মুচিগিরি ইত্যাদি।

দার: দোকানদার, চৌকিদার, রংদার, জেল্লাদার, চড়নদার ইত্যাদি।

দান: বাতিদান, শামাদান, আতরদান ইত্যাদি।

সই: হাতসই, মাপসই, নাগসই, জুতসই, ট্যাকসই ইত্যাদি।

পনা : বুড়াপনা, ন্যাকাপনা, গিন্নিপনা ইত্যাদি।

ওলা বা ওয়ালা : কাপড়ওয়ালা, ছাতাওয়ালা ইত্যাদি।

তর : এমনতর, যেমনতর, কেমনতর ইত্যাদি।

অৎ : মানৎ, বসৎ, ফেরৎ, গলৎ ইত্যাদি।

অৎ+আ : ধরতা, ফেরতা, পড়তা, জানতা ইত্যাদি।

তা : পানতা, নোন্‌তা, তল্‌তা, নাম্‌তা, আওতা ইত্যাদি।

অৎ+ই : ফিরতি, চল্‌তি, চাক্‌তি, ঘাটতি ইত্যাদি।

অৎ+আ+ই : খোলতাই, ধরতাই।

অন্ত : ফুটন্ত, জিয়ন্ত, চলন্ত।

মন্ত : লক্ষ্মীমন্ত, বুদ্ধিমন্ত, আক্কেলমন্ত।

অন্‌দা ? — বাসন্দা (অধিবাসী), মাকন্দা (গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন)।

রবীন্দ্রনাথ এ প্রত্যয়টির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

ট্ : চপট্ (চৌচাপট), সাপট্, ঝাপ্‌ট, দাপ্‌ট।

ট্+ই : চিমটি।

আ+ট্ : জমাট্, ভরাট্, ঘেরাট্ ইত্যাদি।

টা : চ্যাপটা, ল্যাপ্‌টা, ঝাপটা, চিমটা, শুক্‌টা ইত্যাদি।

আট্+ই+আ : রোগাটিয়া (রোগাটে), বোকাটিয়া (বোকাটে) ইত্যাদি।

অং, আং ইং : ভড়ং, ভুজং, ভাজাং, পেং, তিড়িং ইত্যাদি।

অঙ্গ, আঙ্গ, আঙ্গিয়া : সুড়ঙ্গ, সুড়ুঙ্গি, কুলঙ্গি, ধিঙ্গি ইত্যাদি।

চ, চা, চি : আলগচ্, ল্যাংচা, ভ্যাংচা, ভাংচি, খিমচি, ত্যাড়চা।

ক্ষুদ্র অর্থে—ব্যাঙাচি, ঘামাচি, মোচার ক্ষুদ্র মুচি ইত্যাদি।

অস্ : ধপাস্, ধড়াস, পটাস্ ইত্যাদি।

সা : চোপসা, গোম্‌সা, ভাপসা, চিমসা, পানসা, খোলসা ইত্যাদি।

সা+ইয়া : ফ্যাকাসিয়া (ফ্যাকাসে), কালসিটে (কাল্+সা+ইয়া+টা) = কালসিয়াটা, কালসিটে।

আম : অনুকরণ অর্থে : বুড়ামো, ছেলেমো, পাগলামো ইত্যাদি।

ভাব অর্থে : মাৎলামো, ঢিলেমো, আলসেমো ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গে ই : ছুঁড়ি, ছুক্‌রি, বেটি, খুড়ি, মাসি, পিসি, দিদি, বামনি ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গে নি : তেলেনি, কলুনি, ঠাকুরানি, চাকরানি জেলেনি, খোট্টানি ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধটিও ১৩০৮ (১৮৯১ খৃঃ) সালে লিখেছিলেন। প্রত্যয়-গুলোর শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাখ্যা কিংবা প্রয়োগ দেখানো এখানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বাংলা ভাষার বহুবিধ ব্যবহার করতে গিয়ে এ ভাষার শব্দগঠন প্রণালী তাঁর মনকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে তারই প্রেরণায় স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে এ প্রবন্ধে তার কতকগুলো প্রত্যয় বা উপাদান তিনি পরিবেশন করেছেন। সেজন্যে আমিও এগুলোকে অর্থ কিংবা ধ্বনি অনুসারে সাজানোর ব্যর্থ প্রয়াস করিনি। প্রবন্ধটি থেকে তাঁর প্রদত্ত তালিকাটিই এখানে উদ্ধৃত করে দিয়েছি। বাংলায় ব্যবহৃত যাবতীয় কৃৎ-তদ্ধিৎ প্রত্যয়ের তালিকা তিনি দেন নি, দিয়েছেন ব'লে দাবীও করেন নি। যে কোনো একটি প্রত্যয়ের কথা ধরলেই দেখা যাবে যে সেটি কয়েকটি শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে, যাবতীয় শব্দের সঙ্গে নয়। রবীন্দ্রনাথও কৌতূহলবশত এদের ব্যবহারবিধি থেকে এ সত্যটি উপলব্ধি করেছেন। এটি এ-কালের ভাষাতত্ত্বের সাধারণ কথা। শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাবো যে কতকগুলো বাক্‌বিধি কতক-গুলো নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দপ্রকৃতির সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়, সবগুলোর সঙ্গে হয় না। এ থেকে প্রমাণিত হয় প্রত্যেক ভাষারই শব্দগুলির একটি সাহচর্যজনিত পরিমণ্ডল রয়েছে। প্রতিটি শব্দ তার আপন পরিমণ্ডলের মধ্যেই বিহার করে। তবে কোন শব্দ কোন কক্ষে ঘোরাফেরা করে সেটি গবেষণা করে ধরা যেতে পারে। প্রত্যয় গুলো সম্পর্কেও একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই লিখেছিলেন ঃ

> প্রত্যয়গুলির মধ্যে পক্ষপাতিত্বের ভাব দেখা যায়, তাহারা কেন যে কয়টি মাত্র শব্দকে বাছিয়া লয়, বাকি সমস্তকেই বর্জন করে তাহা বুঝা কঠিন। তালিকা হইতে তাহার নিয়ম আবিষ্কারের আশা করা যাইতে পারে।
>
> (শব্দতত্ত্ব, ঐ, পৃ ৩৯৫)

রবীন্দ্রনাথের বাংলা কৃৎ-তদ্ধিৎ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হ'তে না হ'তেই শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় এ প্রবন্ধটির একটি বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃৎতদ্ধিৎ প্রত্যয়গুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ ক'রে ভাষায় সেগুলোর স্বীকৃতি দিয়ে 'বাংলা ভাষাটাকেই মাটি করবার কাজে লেগেছেন।' রবীন্দ্রনাথ উক্ত সালেরই পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' "বাংলা ব্যাকরণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্রের প্রবন্ধের জবাব দেন। তাতে বাংলা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালা নয়, বাংলায় কারক, ক্রিয়া, লিঙ্গ, বচন এবং প্রত্যয়াদির ব্যবহারে এ ভাষা যে

সংস্কৃত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতেই যে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ তথা ব্যাকরণ লিখিত হওয়া উচিত তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও সম্প্রদান কারক সম্পর্কিত মনোজ্ঞ আলোচনাটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সংস্কৃতে, অর্থ ও বিভক্তি-প্রয়োগের দিক থেকে কর্ম ও সম্প্রদান কারক সম্পূর্ণ পৃথক। সেজন্যে সংস্কৃত ভাষায় এ দুই কারকের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। সংস্কৃতের অনুকরণে আজও আমাদের বাংলা ব্যাকরণগুলোতে কর্ম ও সম্প্রদান কারককে পৃথক ভাবে দেখানো হয়। মধ্যযুগের বাংলায় 'মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তায়' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) এবং আধুনিক বাংলা প্রয়োগ 'তিনি হজে যাবেন' প্রভৃতি বাক্যে নিমিত্তার্থে চতুর্থী এবং 'ভিখেরীকে কাপড় দিলাম' প্রভৃতি বাক্যে স্বত্বত্যাগ ক'রে কাউকে কিছু দান করার মধ্যে আমাদের বৈয়াকরণেরা সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছেন। তা ছাড়া আধুনিক বাংলায় কর্মকারকে বিভক্তিলোপের দৃষ্টান্ত আছে, অথচ সম্প্রদান কারকে কোথাও বিভক্তি লোপ হয় না। এ কারণেও এ দুই কারকের পার্থক্য প্রাচীনপন্থী বৈয়াকরণেরা স্বীকার করতে চান। এখানেই রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ—

> সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদান কারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ; বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে একথাই বা কেন না বলা যায়, যে বাংলায় দ্বিবচন আছে। যদি 'ধোপাকে কাপড় দিলাম' কর্ম এবং 'গরিবকে কাপড় দিলাম' সম্প্রদান হয়, তবে এক বচনে 'বালক' দ্বিবচনে 'বালকেরা' ও বহুবচনেও 'বালকেরা' না হইবে কেন। তবে বাংলা ক্রিয়াপদেই বা একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন ছাড়া যায় কী জন্য। তবে ছেলেদের মুখস্থ করাইতে হয়—একবচন 'হইল', দ্বিবচন 'হইল', বহুবচন 'হইল,' একবচন 'দিয়াছে,' দ্বিবচন 'দিয়াছে,' ইত্যাদি। 'তাহাকে মারিলাম' যদি সম্প্রদান কারকের কোঠায় পড়ে তবে 'তাহাকে দিলাম' সন্তাড়ন কারক, 'ছেলেকে কোলে লইলাম' সংলালন কারক; 'সন্দেশ খাইলাম' সন্তোজন-কারক; 'মাথা নাড়িলাম' সঞ্চালন কারক এবং বাংলা কর্মকারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে।
>
> ("বাংলা ব্যাকরণ," শব্দতত্ত্ব, র-র, দ্বাদশ খণ্ড, ৫৬৫—৬৬)

যে-কোনো ভাষার সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদই উক্ত ভাষার নিজস্ব ধর্মের পরিচয় বহন করে; সেজন্যে সাধারণত বিদেশী ভাষা থেকে ঋণ হিসেবে ক্রিয়া সর্বনাম কোনো ভাষাতেই গৃহীত হয় না। ক্রিয়া উদ্যমশীল সেনাবাহিনীর মতো ভাষার

চলতা ধর্মকে রক্ষা করে, তাকে সজীবতা ও গতিদান করে দেখে ক্রিয়াই ভাষাবিশেষের যথার্থ পরিচায়ক। ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহলবশতঃ রবীন্দ্রনাথ এ সত্যও উপলব্ধি করেছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে ১৩০৮ সালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে পুনর্মুদ্রিত তাঁর 'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা'টি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বলা বাহুল্য তাঁর বাংলা ক্রিয়াপদের এ তালিকাটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ।

ভাষাবিশেষের উপভাষাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এজন্যে একটি উপভাষার বর্ণনা বা বিশ্লেষণ অন্যান্য উপভাষার—অন্য কথায় সমগ্র ভাষার – বৈশিষ্ট্য নির্ণায়ক নয়। সেজন্যে একালের বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান একটি লোকের মুখের ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি উপভাষারই যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটনে বিশেষ ভাবে আস্থাশীল। এমনিভাবে ভাষাবিশেষের যাবতীয় উপভাষার পৃথক পৃথক বিশ্লেষণ ক'রেই উক্ত ভাষার সামগ্রিক রূপের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। বাংলা ভাষার সামগ্রিক রূপের পরিচয় উদ্‌ঘাটনে এ-কালের বর্ণনাত্মক ভাষা আলোচনার এ সাধারণ মূল নীতিটির গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথের এ কথাগুলোর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'তে দেখি ঃ

> বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয় তবে বাংলাভাষা বাঙালির কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলা ভাষার কারক ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে। (শব্দতত্ত্ব, ঐ, পৃঃ ৩৭৮)

॥ পাঁচ ॥

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে ১৯৩৮ (১৩৪৫ সাল) খৃষ্টাব্দে তাঁর সাতাত্তর বৎসর বয়সে 'বাংলা ভাষা পরিচয়' বইটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো ভাষা-শিল্পী সমগ্র বাংলা ভাষাতে তো নয়ই, বিশ্বের অন্যান্য ভাষাতেও খুব কম জন্মেছেন। শুধু তা-ই নয় কোনো এক ভাষা-শিল্পীর এত দীর্ঘকাল (প্রায় পৌনে এক শতাব্দী) ধ'রে ভাষা নিয়ে সাধনার উদাহরণও বড়ো বিরল। সে জন্যে বাংলা ভাষার কারবারী রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটা যে গভীর এবং তুলনারহিত অন্তর্দৃষ্টি জন্মাবে তা বিস্ময়করভাবেই সত্য। রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়ে'র ভূমিকায় বলেছেন,' 'বাংলা ভাষা পরিচয়' তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয়, রূপের পরিচয় নিয়ে।' এ ভাষার তত্ত্বঘটিত যা কিছু আলোচনা তিনি তাঁর 'শব্দতত্ত্বে'ই সীমাবদ্ধ রেখেছেন,

এখানে তত্ত্বের যদি কিছু অবতারণা ক'রে থাকেন, তাকে ছাপিয়ে উঠেছে তার রসমাধুর্য।

তাঁর কথায় এ গ্রন্থটি লেখার কারণ, 'ভাষার ক্ষেত্রে চলতে চলতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে, আশ্চর্য করেছে, তারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব বলেই লেখবার ইচ্ছা হ'ল। বিষয়টাকে যাঁরা ফলাও ক'রে দেখেছেন ও তলিয়ে বুঝেছেন, এ লেখায় তাঁদের কাছে ত্রুটো চারটে খুঁত বেরো-বেই। কিন্তু তা নিয়ে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি ব'কে যাব। তাতে ক'রে মনে তোমরা সেই চ'লে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে।'

ভাষার ধ্বনি থেকে নিয়ে তার শব্দগঠন ও বাক্য-প্রয়োগ বিধির খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা বর্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানে সাধারণ ব্যাপার। এ না হ'লে চলে না। এগুলো ভাষারও যেমন মূল কাজ নয়, তেমনি বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের এটি মূল অংশ নয়। ভাষার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় মানুষের কাছে মানুষের মন জানাজানি নিয়ে। এই মন জানাজানির ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বসংঘ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক ক'রে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে মানব ধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।'

ভাষা মানবসমাজের এই বিস্ময়কর ঐক্যের যে প্রতিষ্ঠা করছে সে তার শব্দ, শব্দযোজনা এবং তার অর্থের প্রয়োগ দিয়ে। শব্দার্থের এই কলমুখরতা এবং নিছক আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম ক'রে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অপরূপ শক্তিই মানুষের চিত্তকে পদে পদে অবশ বিবশ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে: প্রতি পদে দোলা লাগছে তার মনে। শব্দের এই ব্যঞ্জনাই ভাষাকে কাব্যিক সৌন্দর্য ও কলাকুশলতা দান করেছে, একটি সামগ্রিক ঐক্য ও মাধুর্যে অভিষিক্ত করেছে। শব্দের সেই অর্থোদ্ধারই বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর অংশ তার শব্দার্থ বিজ্ঞানের কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়ে' খাঁটি বাংলা ভাষার নিরলঙ্কার ও টুকিটাকি শব্দ ও শব্দকণিকার পেছনে যে কি ব্যঞ্জনা নিহিত আছে জহুরীর মতো তার পরিচয় দিয়েছেন।

কোনো ভাষাভাষীই একটি শব্দ সব জায়গায় এবং ভাষার যাবতীয় শব্দ এক জায়গায় ব্যবহার করে না। এমন কি একই শব্দের বিভিন্ন প্রকারের অগণিত প্রয়োগও হয় না। বহু কাল ধ'রে সমাজের অগণিত মানুষের মনের স্পর্শলাভ ক'রে এক একটি শব্দ গড়ে ওঠে, লালিত ও বর্ধিত হয় ব'লে একটি শব্দের মধ্যে বহু অর্থ ও তার ব্যঞ্জনা জড়িয়ে যায়। তার স্বরূপ ও মহিমা উপলব্ধি করতে হ'লে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় বাক্যে ব্যবহৃত তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শব্দের লাবণ্য ও সুষমার ভেতর থেকেই উক্ত শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে হয়। এ ধরনের Cultural ও Collocational Context এর সাহায্যেই বাগর্থবিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ উদ্ধার করে। কবিরা সাধারণত ভাষা বিজ্ঞানী নন, কিন্তু বিধিদত্ত অন্তরদৃষ্টি ও আন্তর শক্তির সাহায্যেই তাঁরা যেমন শব্দের এহেন প্রয়োগজাত অর্থ উদ্ধার করতে পারেন, তেমনি সহজাত চেতনা ও মনীষার সাহায্যে শব্দ বিশেষের প্রয়োগক্ষেত্র বৃদ্ধি ক'রে তার মধ্যে প্রাণাবেগ সঞ্চার ক'রে শব্দকে অভাবিতপূর্ব অর্থের গৌরবে শিহরিত ক'রে তুলতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা পরিচয়' প্রধানত বাংলা শব্দের অর্থগৌরবের এ পরিচয়ই উদ্‌ঘাটন করেছে। সে জন্যে এটি বাংলা ভাষা আলোচনা সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থাদির মধ্যে সবচেয়ে মধুর এবং সুখপাঠ্য।

ভাষায় সাধারণতঃ বস্তুক (concrete) এবং নির্বস্তুক (abstract) এ দুরকম শব্দ পাওয়া যায়। বস্তুক তথা পদার্থবাচক শব্দগুলো একটু না একটু জায়গা জুড়ে থাকে, সেজন্যে তারা প্রত্যক্ষ; কিন্তু নির্বস্তুক শব্দগুলো আকারপ্রকারহীন গুণদোষের আকর ব'লে এ গুলোকে 'আশ্রয় ক'রে মানুষের মন এত দূরে চ'লে যেতে পেরেছে যত দূরে তার ইন্দ্রিয়শক্তি যেতে পারেনা, যত দূরে কোনো যানবাহন পৌঁছায় না।' এই আকারপ্রকারহীন 'ইশারা'র বা 'বোবার' ভাষার প্রয়োগ ও তার অর্থ উদ্ধারই ভাষায় এনেছে চমৎকারিত্ব, বাড়িয়েছে তার গতিবেগ।

রবীন্দ্রনাথ কীভাবে এ রকম একটি শব্দের অর্থ উপলব্ধি ও তার ব্যাখ্যা করেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য :—

> ভালো লাগা বোঝাতে কবি বললেন, 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে'। বল্‌লেন, চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়'। এখানে কথাগুলোর ঠিক মানে নিলে পাগলামি হ'য়ে দাঁড়াবে। কথাগুলো যদি বিজ্ঞানের বইয়ে থাকত তাহ'লে বুঝতুম, বিজ্ঞানী নতুন আবিষ্কার করেছেন এমন একটা দৈহিক হাওয়া

যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাথর কঠিন থাকতে পারে না, গ্যাসরূপে হয় অদৃশ্য। কিংবা কোন মানুষের শরীরে এমন একটি রশ্মি পাওয়া গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে লাবণি, পৃথিবীর টানে যার বিকিরণ মাটির উপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। শব্দের অর্থকে একান্ত বিশ্বাস করলে এই রকম একটা ব্যাখ্যা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু এ-যে প্রাকৃত ঘটনার কথা নয়, এ-যে মনে হয় যেন'র কথা। শব্দ তৈরী হয়েছে ঠিকটা-কী জানাবার জন্যে; সেইজন্যে ঠিক-যেন-কী বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাঁকাতে হয়। ঠিক-যেন কী'র ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নেই, তার সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কাজ চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব। এত বড় জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই কবি লাবণ্য শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ ক'রে বানিয়ে বললেন, যেন লাবণ্য একটা ঝরনা, শরীর থেকে ঝ'রে পড়ে মাটিতে। কথার অর্থটাকে সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দিয়ে এ হ'ল ব্যাকুলতা; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে 'বলতে পারছিনে'। এই অনির্বচনীয়তার সুযোগ নিয়ে** প্রচলিত শব্দকে অপ্রচলিতের চেহারা দিয়ে ভাষার আভিধানিক সীমানাকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল। (বাংলা ভাষা পরিচয়, র-র, ২৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৮১-৮২)

কবিতা থেকে শব্দার্থ কি ভাবে উদ্ধার করতে হয় অর্থবিজ্ঞানের নিয়ম ধ'রেই তাতে মায়াঞ্জন লাগিয়ে তিনি তার দিক নির্ণয় করেছেন। কবিতা কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের ভাষা নয়, সে জন্যে তার রূপ চিত্তহারী হ'লেও তার গতি সীমাবদ্ধ। ভাষার গদ্য রূপ সেখানে আসে সমগ্র জীবনকে কেন্দ্র ক'রে। সেজন্যে গদ্যে ব্যবহৃত ভাষার রূপই তার স্বভাবসুন্দর রূপ। সেখানে শব্দের ব্যবহার, শব্দ সংযোজন যে অর্থমাধুর্য সৃষ্টি করে তা থেকেই মানুষের চলমান সমাজ জীবনের যথার্থ সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। বহু স্বদেশী ও বিদেশী নির্ভার শব্দ, শব্দ সংযোজন, প্রত্যয় ও বাগবিধির অর্থসৌন্দর্যও সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাদের চটুলতা ও মনোহারিত্বও তিনি সমভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন :—

এটা হ'তে পেরেছে তার কারণ, সীমাসরহদ্দি নিয়ে মামলা করে না (বাংলা) চলিত ভাষা। স্বদেশী হালকা ভারি সব শব্দই ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে তার আঙিনায়। সাধু ভাষায় তাদের পাসপোর্ট মেলা শক্ত। পার্সি আরবী কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম ক'রে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। 'বিদায়' কথাটা সংস্কৃত পোশাক পরে বসেছে। 'হয়রান করে দিয়েছে' বল্‌লে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে

যে ভাবটা মনে আসে কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দের তা হয়না। অমুকের কণ্ঠে গানে 'দরদ' লাগে না, বল্‌লে ঠিক কথাটি বলা হয়, ও ছাড়া আর কোনো কথাই নেই। গুরু চণ্ডালির শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে 'সংবেদনা' শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না। (ঐ পৃঃ, ৩৯৬)

কিন্তু একথাও জেনে রাখা ভালো খাস বাংলায় এমন সব বলবার ভঙ্গী আছে যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। শব্দকে দ্বিগুণ করবার একটা কৌশল কথ্য বাংলায় চলতি, কোনো অর্থবান শব্দে তার ইশারা দেওয়া যায় না। মাঠ ধূধূ করছে, রৌদ্র করছে ঝাঁঝাঁ: মানেওয়ালা কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। তার কারণ অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে: উস্‌খুস্‌, ফিস্‌ফিস্‌, ফ্যালফ্যাল, কাচুমাচু শব্দের ধরাবাঁধা কোনো অর্থ নেই। তাদের কাছ থেকে যেন উপরি পাওনা আদায় হয়, তাতে ব্যাকরণী টাঁকশালের ছাপ নেই।

বাংলায় আর একরকম শব্দদ্বৈত আছে তাদের মধ্যে অর্থের আভাস পাই, কিন্তু তারা যতটা বলে তার চেয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বেশী। সংস্কৃতে আছে 'পতনোন্মুখ,' বাংলার বলে 'পড়ো-পড়ো'। সংস্কৃতে যা 'আসন্ন' বাংলায় তা 'হব-হব'। সেই রকম: 'গেল-যেল' 'যায়-যায়'। সংস্কৃতে যা 'বাষ্পাকুল' বাংলায় তা 'কাঁদো-কাঁদো'। সংস্কৃতে বলে 'অবরুদ্ধ স্বরে,' বাংলায় বলে 'বাধোবাধো গলায়'। বাংলায় ঐ কথাগুলোতে কেবল যে একটা ভাব পাওয়া যায় তা নয়, যেন ছবি পাই। একটা শ্লোক বলা যাক—

যাব-যাব করে, চরণ না সরে,
ফিরে ফিরে চায় পিছে,
পড়ো-পড়ো জলে ভরো-ভরো চোখ
শুধু চেয়ে থাকে নীচে।

ঠিক এ রকম এক টুকরো রেখালেখা এই বাধো বাধো ভাষাতেই বানানো চলে। (ঐ, পৃঃ ৪২৩)

বাংলার টুক্‌রো-টুক্‌রো শব্দকণিকা—স্বতন্ত্রভাবে যাদের তেমন কোনো অর্থ নেই কিংবা থাকলেও যাদের অর্থে কোনো মিষ্টতা নেই তারাই—বাক্যে অন্য শব্দের আগে-পরে বসে ভাষাকে করে মিষ্টি, অর্থে যোগ করে মনকে জানা থেকে অজানায় টেনে নিয়ে যাবার ইশারা। রবীন্দ্রনাথ এ গুলোর অগণিত উদাহরণ দিয়েছেন—

যেমন—কেন, কেন বা, কেনই বা ; যেন (যেখানে এর প্রয়োগে বিদ্রূপের ভঙ্গী লাগানো হয়) যেমন 'যেন কার্ত্তিকটি, যেন আহ্লাদে পুতুল, যেন নবাব খাঞ্জে খাঁ' ইত্যাদি। কেন, কেন যে, কি, কী যে ইত্যাদি। তেমনি 'গে' র ব্যবহার যেমন, হোক গে, করুক গে, মরুক গে, কিন্তু আবার 'গে' 'গো' হ'য়ে দাঁড়ালে তা থেকে অন্য রকম মিষ্টতা ঝরে পড়ে যেমন, কিগো, বলি কিগো, ওগো, হাঁগো, ইত্যাদি। 'তেমনি ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় অসংগতভাবে 'না' অব্যয়টির ব্যবহার। এর কাজ হচ্ছে আদেশ বা অনুরোধকে অনুনয়ে নরম ক'রে আনা।' যেমন হোক না, করুক না। এরই সঙ্গে 'না' অর্থে 'হাঁ'এর অর্থ প্রকাশ করার ইশারাও লক্ষযোগ্য, যেমন বলোনা! করোনা! দাওনা! ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ একারণেই বলেছেন 'ক্রিয়াপদের এতরকম ইশারা বোধহয় আর কোনো ভাষায় নেই।'

পরিশেষে বাংলার টা, টি, টু, টুকু, টুকুন, খানা, খানি, গোছা, গাছা, গাছি প্রভৃতি নির্দেশবাচক প্রত্যয়ের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করতে হয়। এগুলোর কোথায় কি ব্যবহার হয় রবীন্দ্রনাথ তার কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ধ্বনিসম্পদ ও শব্দাবলীর অর্থমাধুর্যের যথার্থ স্বাদ না পেলে এই টুকিটাকি প্রত্যয় গুলোর মধ্যে বাংলা শব্দের যে কি সূক্ষ্ম অনির্বচনীয়তা নিহিত আছে তা কেউ ধরতে পারে না। বাংলায় কোথায় যে টা, কোথায় টি, কোথায় টুকু আর টুকুন, কোথায় খানা আর কোথায় বা খানি ব্যবহার করতে হয় এবং তাদের যথাযথ ব্যবহারে অর্থের ব্যঞ্জনা যে কীভাবে গতিবহুল হ'য়ে ওঠে তা বাংলা ভাষা শিল্পীদের মধ্যে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথই সার্থকভাবে ধরতে পেরেছিলেন।

জীবনব্যাপী সাধনায় বাংলা ভাষার এ মাধুর্যের পূর্ণ পরিচয় পেয়েছিলেন ব'লেই বাংলা ভাষা আলোচনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ এমনতরো উক্তি করতে পেরেছিলেন-'বাংলা ভঙ্গিওয়ালা ভাষা। ভাব প্রকাশের এমন সাহিত্যিক রীতি অন্য কোনো ভাষায় আমার জানা নেই।'